দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ JAN. 13 1999
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৬

612

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কী ঘটছে?'

প্রতিক্রিয়া

সায়েমা খাতুন

সমাজে অন্যায়-নির্যাতন, বৈষম্য নিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ কথা বলে। এর প্রতিবাদ- প্রতিরোধ নিয়ে মতপার্থক্যও অনেক। কিন্তু কি মানবতাবাদী উদারনৈতিক, কি প্রগতিশীল সমাজবাদী, ডান-বাম উভয় পক্ষই যেখানে প্রায় এক সুরে কথা বলতে শুরু করে, তা হলো লিঙ্গীয় নিপীড়নের ক্ষেত্রগুলোতে। তা না হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন-নিপীড়ন বিরোধী আন্দোলন-সংগ্রাম নিয়ে নির্মল সেনের মতো লড়াকু সমাজবাদীও কেন ক্ষমতাবানদের পক্ষ ঘেঁষা লেখা লিখতে যাবেন? বিশেষত, যেখানে মধ্যবিত্ত চৈতন্য ও মধ্যবিত্ত নৈতিকতাকে চ্যালেঞ্জ করাই হতে পারে সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখা মানুষের প্রথম কাজ। নির্মল সেন সমাজের সবচেয়ে নিপীড়িত নিম্নবর্গের মানুষদের মধ্যে সমস্ত জীবন কাজ করবার অভিজ্ঞতা থেকে নারীর শ্রম ও যৌন শোষণের দ্বিবিধ চেহারাকে চেনেন না, তা মনে করা অসম্ভব। কেউ যখন ক্ষমতাহীনদের পক্ষে ক্ষমতাবানদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে কথা বলবেন বা দাঁড়াবেন বলে সঙ্কল্প করেন তিনি তিনি কেবল শ্রেণী ক্ষমতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন না, লিঙ্গীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধেও তাকে মুখ খুলতে হবে। পরস্পর প্রবিষ্ট এই ক্ষমতাচর্চার কেবল একটি নিয়ে কথা বলে, অন্যটি সম্পর্কে নিশ্চুপ থেকে অথবা অন্যটির সহায়ক সুরে কথা বলে আমরা সমাজের কি ধরনের বদলের লড়াইয়ে শরীক হব? সেই কাঙ্ক্ষিত সমাজ তো এমন হতে পারে না, যেখানে শ্রেণী আধিপত্য বিলুপ্ত হলেও লিঙ্গীয় আধিপত্য বহাল থাকবে যা সাবেক সমাজতন্ত্রী দেশগুলোতে ঘটেছিল।

এ কথাগুলো এজন্য আসছে যে, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কি ঘটছে' শিরোনামে একজন নির্মল সেনের লেখা যে প্রত্যাশা নিয়ে আমরা শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখা মানুষজন পড়তে বসি, প্রবলভাবে ধাক্কা খাই, যখন তিনি যৌন-নিপীড়নের মতো অবমাননাকর ও নির্যাতনমূলক আচরণকে আর দশজনার মতো ভালবাসা ও প্রেমের সম্পর্কের সাথে গুলিয়ে ফেলেন। এবং যৌন হয়রানির সাথে ভালবাসার ইতিবাচক (!) সম্পর্ক বিশ্লেষণকে কেন্দ্রীয় বিষয় মনে করেন। এ ধরনের আলোচনা থেকে মনে হতে পারে প্রেম ও বিয়ের সম্পর্কের মধ্যে কোন যৌন-নির্যাতন নেই এবং প্রেমিক ও স্বামী কখনও যৌন-নির্যাতক হতে পারে না এবং এর বিচারও দাবি করা যাবে না। অথচ বাংলাদেশের নারীরা শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে তাদের স্বামীদের দ্বারা হরহামেশাই ধর্ষিত হয়ে থাকে। কিন্তু এতে করে নারীর সমাজ নির্দিষ্ট মূল্য ("সতীত্ব বা পবিত্রতা") অক্ষুণ্ন থাকে বলে সমাজ কর্তারা তো বটেই এমনকি অনেক সমাজ বিদ্রোহীরাও নির্লিপ্ত থাকেন।

একটি মেয়ে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে তো প্রত্যেকে প্রমাণ ছাড়াই সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করে, কিন্তু একজন পুরুষ যৌন-নির্যাতন করেছে তার প্রমাণ ও অভিযোগ থাকলেও পুরুষ এবং পুরুষবাদী নারীরা তা বিশ্বাস করতে নারাজ। হয়ত তাদের চোখের সামনে ঘটলেও তারা নারীকেই দোষারোপ করবেন ভেড়ার পানি ঘোলা করার দোষের মতো। নির্মল সেন যে গল্পের উদাহরণ টেনেছেন তাতে তিনি যৌন হয়রানির সম্ভাব্য শিকার নারীর পক্ষে বলেননি। বরং পুরুষদের যৌন হয়রানির অভিযোগ থেকে রেহাই পাবার সপক্ষে সাফাই তৈরি করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বিভাগীয় প্রধান প্রথম শ্রেণী পৈতৃক সম্পত্তি মনে করে কন্যাকে বিয়ে করার বিনিময়ে যৌতুক হিসাবে প্রথম করবার প্রতিশ্রুতি দেন, এই বিদ্যাজাগতিক ক্ষমতাচর্চাকেও তিনি যৌন হয়রানি বলতে চান। অথচ শিক্ষক ছাত্রীকে নির্যাতন করেছে তা বিশ্বাস করার আগে তার ছাত্রজীবনের শিক্ষক-ছাত্রীর প্রেমের গল্প ফেঁদে বসলেন। যার 'মরাল' হচ্ছে 'মেয়েদের কখনও বিশ্বাস করো না', ঠিক যে সুরে মালিক শ্রমিককে অবিশ্বাসের কথা জানায়, ঠিক যে সুরে আমরা মধ্যবিত্তরা বাড়িতে যে কোন চুরির ঘটনাতেই ঘরের সর্বনিম্ন পদস্থ ব্যক্তি কাজের লোককে অবিশ্বাস করি, এবং এসব শ্রেণীকে বিশ্বাস না করবার পরামর্শ দিয়ে উচ্চশ্রেণী সংহতি প্রকাশ করি, তার সাথে এই শক্তিশালী পুরুষ সংহতির মৌলিক কোন ফারাক নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রীদের যৌন-হয়রানির অভিজ্ঞতা প্রাক্তন ছাত্রীরাও তো এখন বলতে শুরু করেছেন। বর্তমান ছাত্রীদের ঘটনাও তো বহুজনেই জানেন। গত ৩ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির সেমিনার কক্ষে আয়োজিত মুক্ত আলোচনাতেও অনেক শিক্ষক এবং প্রাক্তন ছাত্রীরা এসব ঘটনা যে বহুদিন থেকেই ঘটছে কিন্তু সামাজিক মূল্যবোধের চাপে প্রকাশ্যে আলোচিত হতে পারেনি তা বলে গেছেন। কেউ যদি নির্যাতন ঘটে বা ঘটেছে এর সত্যতাই অস্বীকার করেন অথবা তাকে যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য মনে না করেন, তাহলে তার কাছ থেকে আমরা কিই বা প্রতিবাদী ভূমিকা আশা করতে পারি? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষমতাবান শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রীকে যৌন-নিপীড়নের ঘটনা প্রসঙ্গে সমাজে বেশ্যাবৃত্তির অস্তিত্বের আলোচনা করে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন তা আমাদের মতো পাঠকদের কাছে স্পষ্ট হয়নি।

একটি বিষয়ে তথ্য যথাযথভাবে ওয়াকিফহাল না হয়ে মন্তব্য করে ফেলাও অত্যন্ত সমস্যাজনক। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাবলী পত্র-পত্রিকায় যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে এবং তদন্ত রিপোর্টের প্রাসঙ্গিক অংশ বিভিন্নস্থানে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে একজন সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের অন্তত এটুকু জানা থাকা প্রয়োজন ছিল যে, আত্তলিয়ার ঘটনা ঘটেছিল আন্দোলন শুরু হবার পরে, সেই ঘটনা নিয়ে আন্দোলন হয়নি। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্রী দেশের যে কোন স্থানে ধর্ষিত হলেও তার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাবে না কেন? ইরাকে মার্কিনী আগ্রাসনের প্রতিবাদ বাংলাদেশে বসে আমরা করব না?

'মূল শত্রুকে চিহ্নিত না করে আগাছায় হাত দিয়ে লাভ নেই, তবে মূল শত্রুকে কিভাবে আঘাত করতে হবে? মূল শত্রু এই পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থা কি একটি মূর্তি যে তাকে আমরা সকলে মিলে খান খান করে দেব, অথবা একটা কুশপুত্তলিকা যে দাহ করব, অথবা আমাদের আকাশ আচ্ছন্ন করা মাকড়শার বাসার মতো ডিশ এ্যান্টেনাগুলো যে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেব? নাকি আমাদের প্রান্তিক পৃথিবীর মানুষজনের জীবনকে গ্রাস করে নেয়া অর্থনৈতিক ও মতাদর্শিক ব্যবস্থা, যার বিরুদ্ধে আমরা নিরন্তর লড়াই করি প্রত্যেকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে? পুঁজিবাদী পুরুষবাদী মতাদর্শের যে কোন প্রকাশকেই কি আমরা আঘাত করবো না? যৌন-নিপীড়ন বিরোধী আন্দোলনের স্থান কি "সমাজ বদলমুখী সাংস্কৃতিক আন্দোলন"-এ নেই? রক্ষণশীলরা পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি তুলতে পারে এই ভয়ে প্রগতিশীল সহশিক্ষার মধ্যস্থিত নির্যাতনসমূহ ও বৈষম্যের চেহারা উদঘাটন করা যাবে না, এই ধামাচাপার যুক্তি মেনে নিতে আমরা নারাজ। এই যুক্তি মেনে নেয়ার অর্থ হচ্ছে বৈষম্য বিরোধী লড়াইয়ে শামিল কোন সমাজতন্ত্রী দলের মধ্যে নিপীড়ন ও বৈষম্য থাকলে তা নিয়ে অভিযোগ করা যাবে না--কারণ, পুঁজিবাদী মহল আস্কারা পেয়ে যাবে। বরং নির্মল সেন নিজেই রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়েছেন এঙ্গেলসকে উল্টো ব্যাখা করে।

এঙ্গেলসের 'পরিবার, ব্যক্তি মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' নামক যে গ্রন্থটি মার্কসবাদী নারীবাদী চিন্তার ভিত্তি তাতে তিনি বুর্জোয়া মনোগামী পরিবারের চিরন্তন নৈতিক আদর্শের ধারণা ভেঙ্গে দেন; এঙ্গেলস বলেন, ব্যক্তি মালিকানার উৎপত্তির সাথে সাথে নিজের জৈবিক বংশধরের কাছে সম্পত্তির উত্তরাধিকার বাহিত করার প্রয়োজনে পুরুষ মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে হটিয়ে দিয়ে পিতৃতান্ত্রিক একগামী (যা কেবল নারীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য) পরিবারের নীতি-আদর্শ-পবিত্রতা প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করে, যা আসলে ব্যক্তি সম্পত্তির মতাদর্শজাত এবং ব্যক্তি সম্পত্তির প্রয়োজনেই এর অস্তিত্ব। এই ব্যক্তিসম্পত্তির ধারণাজাত একগামী পরিবারকেই মার্কসবাদী মতে নারী অধঃস্তনতার উৎস হিসাবে বলা হয়। এবং সমাজ বিকাশের যে পর্যায়ে অন্তর্গত দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাসহ সকল প্রকার ব্যক্তি মালিকানার উচ্ছেদ ঘটবে, তার সাথে বুর্জোয়া পরিবারের বিলোপ ঘটবে, সেই পুনর্বিন্যস্ত সামাজিক সম্পর্কে নারীর মুক্তির ইঙ্গিত করা হয়। এঙ্গেলসের ছিটেফোঁটা পঠন দিয়েও আমাদের মতো সামান্য পাঠক বুর্জোয়া পারিবারিক মতাদর্শের পক্ষে দাঁড়াতে পারে না। সেখানে নির্মল সেনের মতো সমাজবাদী নেতা যখন এই বুর্জোয়া মতাদর্শিক অস্ত্র ব্যবহার করেন এঙ্গেলসেরই নামে তখন আমাদের বিস্মিত, ক্ষুব্ধ এবং হতাশ না হয়ে উপায় থাকে না--"যাকে বিয়ে করার নিশ্চয়তা নেই, তার সাথে বসবেন, হাঁটবেন, হাত ধরবেন, তাকে বিয়ে করতে না পারলে আত্মহত্যা করবেন, এমন কথা বলে আবার অন্যের পিছু ছুটলে সেটাও কি ব্যভিচার হবে না, সেটা কি এক ধরনের হয়রানি নয়?" আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে "একেবারে সুক্ষ্ম যৌন হয়রানি" বলে যে ঘটনাটি চিহ্নিত করে প্রশ্ন ছুড়লেন তা কোন পুরুষের প্রতি নয়। তার মতে নারীর প্রতি হয়রানি নিয়ে আন্দোলনের আগে পুরুষের প্রতি নারীর যৌন হয়রানিকে (?!) বুঝতে হবে এবং কেবলমাত্র তারপরই আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করা যাবে, তার আগে কোনভাবেই নয়। যার উদাহরণ তিনি টেনেছেন ব্রজমোহন কলেজের এক ছাত্রীর প্রেমাসক্ত শিক্ষকের সাথে বিয়ে রাজি হয়েও অন্যত্র 'বিয়ে হয়ে যাবার' ঘটনা দিয়ে। যেখানে নারীর 'বিয়ে হয়ে যায়', 'বিয়ে' নামক ক্রিয়াটিতে নারী কোনভাবেই কর্তা নয়, সে বিয়ে করে না, তার বিয়ে হয়--সে চাইলেও না চাইলেও, সেখানে বিয়ের প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে নারীকে বিশ্বাস না করবার ইংরেজী শিক্ষকের বিদ্বেষী বাণী অধঃস্তনতা ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কি করে গ্রহণ করা সম্ভব হয়, তা বোধগম্য নয়। এখানে এই ডিসকার্সিভ লড়াইয়ের মজার জায়গাটি হচ্ছে, মেয়েরা যখন বড় হতে থাকে তাদের কিন্তু গুরুজনেরা এই শিক্ষা ও বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিতে চান যে, 'কোন পুরুষকেই বিশ্বাস করো না'। যদি কেউ সেই শিক্ষা ভুলে গিয়ে কোন পুরুষকে বিশ্বাস করে, অথবা মনে করে তিনি তো আমার শিক্ষক হাজার হোক। তিনি আমাকে নির্যাতন করতে পারেন না, তখন নির্যাতক শিক্ষকের চেয়ে বিশ্বাসপ্রবন ছাত্রীটিই সবার চোখে বিস্ময়করভাবে দোষী হয়ে পড়ে। ধরুন যদি ব্রজমোহনের সেই ছাত্রীটি অশ্বিনীকুমারকে উপেক্ষা করে, সদ্য চালু হওয়া সহশিক্ষাকে বিপন্ন করে সাহস দেখিয়ে পছন্দ করা শিক্ষককে বিয়ে করতে সমর্থ হতো (অবশ্য ইংরেজী শিক্ষক এই সাহস দেখাতে রাজি ছিলেন কিনা সেটাও একটা জিজ্ঞাসা), তখনও কিন্তু তার সাহসের প্রশংসা না করে তাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথাকথিত ভাবমূর্তি নষ্ট করার দায়িত্ব একলাই কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হতো। ক্ষমতার এই মতাদর্শিক জায়গাগুলো স্পষ্ট না হলে নির্যাতনকে বারবারই ঢেকে দেবার প্রক্রিয়াগুলো চলতে থাকবে।

নির্যাতনকে ঢেকে রেখে ভাবমূর্তি রক্ষার মধ্যবিত্ত হিপোক্রেসির নোংরা চেহারাটা বের করে দেয়া অতি জরুরী। যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত দেশের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনশীল মানুষদের গার্মেন্টস কর্মীদের গালিতে পরিণত করার স্পর্ধা দেখায়, যে বিশ্ববিদ্যালয় এই মধ্যবিত্তের শ্রেণী ক্ষমতার একটা কেন্দ্র এবং যে মধ্যবিত্ত নৈতিকতাবোধ সকলের জন্য প্রযোজ্য ও বৈধ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত, তাকে প্রশ্নবিদ্ধ না করে যৌন-নিপীড়নকে কেন্দ্র করে শ্রেণী ও লিঙ্গের রাজনীতি অনুধাবন অসম্ভব।